ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

আমার অনুজপ্রতিম সাংবাদিক অমিত সর্বাধিকারী তাঁর রিপোর্টার জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের সঞ্চিত অর্থনাশের প্রক্রিয়া হিসাবে 'কালজয়ী' নামে একটি সংবাদ পাক্ষিক প্রকাশ করেছিলেন ২০০৩ সালে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমি রিপোর্টার জীবন অতিক্রম করেছি সেগুলি সাজিয়ে তাঁর কাগজে লেখার জন্য অমিত আমাকে খুবই চেপে ধরে। তাঁর প্রবল আগ্রহে খানিকটা 'ছেলেমানুষ' মন নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছিলাম। কারণ, 'কালজয়ী' অমিত কতদিন আর চালাতে পারবে? ব্যাপারটা তাই ঘটেছিল। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কাগজে প্রতি সংখ্যায় আমার লেখাগুলি বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা ফোন করে, চিঠি লিখে তারিফ করতে লাগলেন। কিন্তু কাগজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার লেখাও বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় আমি দেশবিভাগকালীন রাজনীতি এবং পঞ্চাশের (১৯৫০) পূর্ব বাংলার দাঙ্গা সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক লেখা লিখি। এটি বই হয়ে ''বঙ্গ সংহার এবং'' নামে ২০০২ সালে প্রকাশের পর বিখ্যাত মনস্বী পণ্ডিত অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত The Statesmen পত্রিকায় 'Look back Tragedy' এই শিরোনামে খুব বড়ো একটা লেখা লিখে আমার ওই বইটির এবং বিশেষ করে আমার রচনাশৈলীর অভাবিত প্রশংসা করেন। এতে আমার সাহস এবং অনেকটা দুঃসাহসও বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে আমার বন্ধু 'চতুরঙ্গ'-র সম্পাদক আবদুর রাউফ তাঁর কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধুর বাড়িতে 'কালজয়ী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় আমার লেখা দেখতে পেয়ে সেগুলি নিয়ে আসেন। তিনি অনেকটা অভিমানের সুরেই আমাকে বলেন যে ওই লেখাগুলি আমি কেন 'চতুরঙ্গ'-র জন্য লিখলাম না? তিনি বলেন, ''যা হোক, এই লেখাগুলি আমি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ছাপাব এবং আপনি ধারাবাহিক এই লেখাটি লিখবেন...।'' এটাই হল 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' লেখাটির গোড়ার কথা। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কয়েকটি কিস্তি প্রকাশের পর আমার লেখাপড়া জীবনের খুব কম কথা বলা অথচ বেশ ভালোলাগা বন্ধু অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষ একদিন 'চতুরঙ্গ' কার্যালয়ে দেখা হতেই আমাকে স্পর্শ করে বললেন '... চতুরঙ্গ হাতে এলেই আগে তোমার লেখাটি পড়েনি।' শঙ্খ ঘোষের এই কম কথা বলার উক্তি আমার অনেকখানি পাওনা। এরপর আমাদের সাংবাদিক জীবনের গোড়ার দিকের দুঃসাহসী, সমাজসেবিকা

অশোকা গুপ্ত ফোন করলেন—বললেন 'আমি কী আপনাকে চিনি?' আমি জবাব দিয়েছিলাম 'অবশ্যই'। তবে 'আপনি' সম্বোধনে নয়—'তুমি' বলে...।' ওই সময় আমি বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবিকা ওড়িশার মালতী চৌধুরি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অশোকা গুপ্তের নোয়াখালির দিনগুলির উল্লেখ করেছিলাম। অশোকা গুপ্ত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন "...তুমি আমাদের সেই দিনগুলোর কথা লিখছ...খুব ভালো লাগছে...।" এটাও আমার একটা উপরি পাওনা। এ ছাড়া 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পরিচালক নীহার চক্রবর্তী এবং সম্পাদক আবদুর রাউফকে অসংখ্য পাঠক ফোন করে এরকম একটা ধারাবাহিক লেখার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

পরিশেষে আমার আর-একজন সাংবাদিক বন্ধু এবং আমার লেখার একজন অনুরাগী পাঠক মধুময় পাল আমাকে জানালেন যে তিনি এই 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' ধারাবাহিক স্মৃতিচারণটিকে বই করে প্রকাশের ব্যাপারে কোনো প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন কী না। আমি সম্মতি জানালে তিনি 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার সন্দীপ নায়কের সঙ্গে কথা বলেন। সন্দীপবাবু সাগ্রহে সম্মতি জানালে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়। এই 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' প্রকাশনার ব্যাপারে সন্দীপবাবু, মধুময়বাবু ছাড়াও আরও একজনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মেঘ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমান মেঘ বইটি যথাসম্ভব নির্ভুল ও সুচারুরূপে প্রকাশের ব্যাপারে যত্নশীল ও উদ্যোগী হয়েছে। এখন এই বইটি পাঠকমহলে আদৃত হলে আমরা কৃতার্থ হই।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

ডিসেম্বর ২০০৯
ব্লক-পি, ফ্ল্যাট -৮
বেলগাছিয়া ভিলা (এম আই জি)
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

॥ ১ ॥

দাঙ্গার ক্ষত তখনও কলকাতার বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। দেশবিভাগের পর উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলা) এবং তার ফলে পশ্চিমবাংলার শিয়ালদা স্টেশনে তখন পূর্ববাংলার উদ্‌বাস্তুদের আশ্রয়। ১৯৫০ এর দাঙ্গার মানসিক ও আর্থিক দুর্দৈব মাথায় নিয়ে অশোক দাশগুপ্তের (পরবর্তীকালে সমাজবাদী নেতা হিসাবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন) হাত ধরে *লোকসেবক* পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করলাম। সময়টা তখন ১৯৫০-এর অক্টোবরের শেষ। বাংলার খাদি আন্দোলনের পুরোধা কুমিল্লা 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর নেতা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন 'লোকসেবক' পত্রিকার সম্পাদক। যদিও পত্রিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল আই এন টি ইউ সির নেতা পঞ্চানন ভট্টাচার্যের ওপর। কিন্তু তাঁর প্রধান জীবিকা ছিল শিক্ষকতা। অশোকবাবু আমাকে পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, একবার পরীক্ষা করে দেখুন না কাজ চলবে কী না। পঞ্চাননবাবু চেয়ারের পিছনের আলমারি থেকে একটা মোটা বই বের করে পাতা উলটিয়ে বইয়ের মাঝখানে চলে গেলেন। দুটো পাতা দেখিয়ে বললেন, এ দুটো পাতার বাংলা করো, এই কাগজ কলম ও ডিকশনারি রইল। বলেই পঞ্চাননবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বইটি ছিল জওহরলাল নেহরুর *Glimpses of World History*; তাতে **Disarmament** অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের উপর নেহরুর বয়ান। এই ইংরেজি বয়ানের বাংলা করো। করতে হবে। চোখ-মুখ-কান গরম হয়ে উঠল। কেবল ক্রিয়াপদ ছাড়া নেহরুর ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলির প্রায় সবটাই আমার কাছে অপরিচিত। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে একটা বাংলা তর্জমা দাঁড় করানো হল। অনেকক্ষণ বসে আছি। অবশেষে পঞ্চানন বাবু ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কি, করে ফেলেছ? আমি ভীতভাবে বললাম, করেছি তো, কিন্তু কী দাঁড়িয়েছে জানি না। পঞ্চাননবাবু খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গা 'আন্ডার লাইন' করে বেল বাজালেন। পিয়োনকে বললেন, শৈলেনবাবুকে ডাকো। শৈলেনবাবু এলেন। ধুতি হাফশার্ট পরা, চোখ দুটো খুব জ্বলজ্বলে। বিড়ি মুখে নিয়েই তিনি এলেন। শৈলেনবাবুর হাতে আমার বাংলা তর্জমা তুলে দিয়ে ওঁকে বললেন, খুব খারাপ হয়নি। মনে হয় চলবে। শৈলেনবাবু আমাকে নিয়ে নিউজ রুমে ঢুকলেন।

জীবনে এই প্রথম টেলিপ্রিন্টারের সঙ্গে শুভদৃষ্টি। শৈলেনবাবু অর্থাৎ শৈলেন রায় জন্মলগ্ন থেকেই *লোকসেবক* পত্রিকার বার্তাসম্পাদক বা নিউজ এডিটর। দেশবিভাগের আগে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লিগের দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ'-এ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন শৈলেনবাবু। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ এমন সাংবাদিক খুব বেশি তখন কলকাতায় ছিলেন না। এহ

শৈলেন রায়ের কাছে আমার হাতেখড়ি। টেলিপ্রিন্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেশিন চলাকালীন কীভাবে দ্রুত শেষ হওয়া সংবাদ ছিঁড়ে নিতে হয়, কীভাবে সংবাদের শ্রেণিবিন্যাস করতে হয়, এ সব তাঁর কাছে শেখা। শৈলেনবাবু জীবনে কোনও বড়ো কাগজে চাকরি পাননি। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য। সে সময় তাঁর কাছে নিয়মিত আসতেন *স্বাধীনতা*-র এক সময়কার বার্তাসম্পাদক সুকুমার মিত্র, *গণবার্তা* সম্পাদক ননী ভট্টাচার্য (আর এস পির এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মন্ত্রী)। এ ছাড়া আর-একজন আসতেন তিনি ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মন। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্মী ছিলেন। ওই সময়ে তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' মৌলানা আক্রাম খাঁর 'মোহম্মদী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। সম্ভবত ১৯৫১ সালেই। শৈলেনবাবু ও অদ্বৈতবাবু বাল্যবন্ধু। কুমিল্লার একই গ্রামের লোক, যে গ্রামের মধ্য দিয়ে তিতাস বয়ে গিয়েছে। শৈলেন রায়ের প্রসঙ্গে আবার পরে আসব।

লোকসেবক পত্রিকা নিয়ে বলা দরকার। পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে পদত্যাগ করলেন। ড. ঘোষের মন্ত্রিসভার বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন তখনকার কংগ্রেসের 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর। এদের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. ঘোষের অর্থমন্ত্রী অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরি। ড. ঘোষের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের হুগলি-বর্ধমান-মেদিনীপুর গোষ্ঠীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল। এই সময় থেকে 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিরা একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় এই পত্রিকার বাড়িটি (৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড) ছিল 'আজাদ' পত্রিকার অফিস। শুনেছি বাড়িটির আসল মালিক ছিলেন বগুড়ার নবাবেরা। তাঁদের কাছ থেকে বাড়িটি লিজ নিয়েছিলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ (*আজাদ* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক)। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে *আজাদ* পত্রিকা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে ড. প্রফুল্ল ঘোষের উদ্যোগে বাড়িটি কেনা বা লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। নিহত হওয়ার আগে গান্ধিজি কংগ্রেস সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'লোকসেবক সংঘ' নামে যে সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তা থেকেই *লোকসেবক* নামটি অনুসৃত। এই সময় 'লোকসেবক' ট্রাস্ট গঠন করে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'লোকসেবক' পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকেই সরকার বিরোধী খবরের কাগজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী অর্থাৎ ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডা. সুরেশ ব্যানার্জি ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিদের মতো শ্রদ্ধেয় জননেতা এবং ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা এই পত্রিকার কর্ণধার থাকায় অসংখ্য নির্ভুল ও প্রামাণ্য দলিল সহ সংবাদ এই পত্রিকাটির গোচরে আনা হত। *লোকসেবক* পত্রিকার তিনটি খুব বড়ো সংবাদ এই রাজ্যকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। এই সংবাদগুলির প্রথমটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার 'ফোটোস্ট্যাট' সহ সংবাদ। এর ফলে তখনকার উপাচার্য ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এর

পর কলকাতার প্রথম শিল্পমেলার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দুর্নীতির অভিযোগ। এই শিল্পমেলার সংগঠক ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। জ্ঞানাঞ্জনবাবু মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি বেশির ভাগ সময়ে বিধানবাবুর বাড়িতে থাকতেন। তিনি শিল্পমেলার স্মারকগ্রন্থে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বিধানবাবুর 'লেটারহেড'-এ একজন শিল্পপতিকে চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিটির 'ফোটোস্ট্যাট' 'লোকসেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে বিধানসভায় সে সময় তোলপাড় হয়েছিল। ঘটনাটি ওই পত্রিকায় প্রকাশের পর বিধানবাবু *লোকসেবক* পত্রিকার কর্ণধার অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পরে অন্নদাবাবু তাঁর রিপোর্টারদের বলেছিলেন, ডা. রায় আমাকে বললেন, 'শোনো অন্নদা এটা ঠিক যে জ্ঞানাঞ্জন মোটেই কাজটা ভালো করেনি। কিন্তু আমি ওকে এ নিয়ে গালমন্দ করতে পারব না। এর কারণটা তোমায় বলছি, জ্ঞানাঞ্জন শৈশব থেকে মাতৃহারা। আমার মা ওকে মানুষ করেছেন। মাকে মাঝখানে রেখে আমি ও জ্ঞানাঞ্জন দু'পাশে শুতাম। আমরা দুজনে মারামারি করে মাতৃদুগ্ধ পান করতাম। জ্ঞানাঞ্জন আমার কাছে এলে আমার মাকে খুব মনে পড়ে যায়।' ড. রায়ের এই কথা শুনে অন্নদাবাবু তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি এই ব্যাপারে রিপোর্টারদের আর কিছু লিখতে বলবেন না।

এর পরের ঘটনাটি হল, বিখ্যাত অধ্যাপক ঐতিহাসিক এবং কাব্যময় বাংলা গদ্যের অন্যতম সুলেখক ড. নীহাররঞ্জন রায়কে নিয়ে। নীহারবাবু ১৯৪৯ সালের কোনও এক সময়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর এক সুরূপা প্রিয় ছাত্রীকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। পত্রটিতে ছিল আগাগোড়া ভালোবাসার কথা। কিন্তু তা ছিল অসাধারণ কাব্যময় প্রেমপত্র। ছাত্রীকে ভালোবাসার প্রশ্নে তাঁর বিরুদ্ধে নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে। 'লোকসেবক' নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা ওই পুরো চিঠিটি ছেপে দেয়। বিধানসভা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সিন্ডিকেটে তোলপাড়। সেনেটে ড. নীহাররঞ্জন রায়কে ভর্ৎসনা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ভর্ৎসনার জন্য অসাধারণ প্রতিভাময় অধ্যাপক এবং মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারলেন না।

নভেম্বর মাসের (১৯৫০) শেষে অথবা ডিসেম্বরের গোড়ায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য মশাই আমাকে বার্তা বিভাগ থেকে ডেকে পাঠালেন। আমি ওঁর ঘরে ঢুকে দাঁড়াতেই উনি বসতে বললেন। আমাকে বললেন, আমার ঘরে ঢোকার দরজার দু'পাশে দুটো বড়ো বাকসো দেখতে পাচ্ছ তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। উনি বললেন, ওর একটা লেখায়, 'লোকসেবক ট্রাস্ট' আর একটাতে আমি যে ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারি তার নাম লেখা। আমি বললাম, তাও দেখেছি। পঞ্চাননবাবু বললেন, ওই দুটো বাকসোতেই চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। লোকসেবক ট্রাস্ট নামাঙ্কিত বাকসে যে টাকা লোকেরা দান করে যায় তা লোকসেবক পত্রিকা পরিচালনার জন্য খরচ করা হয়ে থাকে। আর অন্যটায় আমার ইউনিয়ন চালানোর খরচ। সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ আমাদের টাকার জোর খুব একটা নেই। কিন্তু তোমাকে

তো কিছু পয়সা দিতে হবে। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও নিরুত্তর। পরে একটু থেমে উনি বললেন, তোমাকে ১৮ টাকা করে দেব এবং প্রতিমাসে ঠিক সময়ে পাবে কি না তাও অনিশ্চিত। তখন আমি খানিকটা হেসে ফেললাম। বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু যে ১১ মাস লোকসেবকে কাজ করেছি তাতে আমার প্রায়শই মনে হয়েছে যে পঞ্চাননবাবু কী হিসাবে ১৮ টাকা ঠিক করলেন! ওটা ১৫ হতে পারত বা ২০ টাকা হতে পারত।

সম্ভবত ওই নভেম্বরেই ডা. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন হল। একদিন সন্ধেবেলায় অফিসে ঢোকার মুখে দেখি লোকে লোকারণ্য। এত ভিড় যে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে লোককে ধাক্কা মারতে হচ্ছে। ওই ভিড় ঠেলতে ঠেলতে দেখতে পেলাম সুরেশ ব্যানার্জি ও প্রফুল্ল ঘোষ দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। তাঁদের পেছনে দেবেন সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। আমি বার্তাবিভাগে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম— কী ব্যাপার? এত ভিড় কেন? তখন যারা বার্তাবিভাগে ছিলেন বললেন, এঁরা তো কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি করলেন গো। রাত্রি ৮টার পর পঞ্চাননবাবুর ঘরে বার্তাসম্পাদক শৈলেনবাবু ও চিফ রিপোর্টার অজিত চক্রবর্তীর ডাক পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে শৈলেনবাবু অজিতবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বার্তাবিভাগে এলেন। তার ঠিক একটু পরেই অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরি মশাই বার্তাবিভাগে প্রবেশ করলেন। তিনি শৈলেনবাবুকে বললেন, ব্যানার হেডলাইন-ই করে দেবেন। একবার যদি আমাকে দেখিয়ে নেন। এই বলে চলে গেলেন। পরের দিন যথারীতি কংগ্রেসের এই ভাঙনের খবর কলকাতার সব কাগজে বের হল। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এই নতুন পার্টির নাম হল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, সংক্ষেপে কে এম পি পি। তখনও প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস ছিল ঠিক মৌলালির মোড়ে উত্তর-পশ্চিম কোণার বড়ো বাড়িটিতে। নতুন পার্টির জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসেবক পত্রিকা নিশ্চিতভাবেই বিরোধী দলের মুখপত্রের মর্যাদা পেল।

বার্তাসম্পাদক শৈলেনবাবু ছাড়া বার্তাবিভাগে সকল কর্মী ছিলেন পার্ট টাইমার। এঁরা কেউই বিকেল ৪টে-৫টার আগে আসনে না। এই পার্ট টাইমারদের বেশির ভাগই স্কুল শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অল্প কয়েকজন সরকারি কর্মচারীও ছিলেন। এই পত্রিকায় আমার ১১ মাসের শিক্ষানবিশি কালের মধ্যে বার্তাসম্পাদককে বাদ দিয়ে আর যে দু'জন লোক আজও আমার মনের খুব বড়ো আসনে রয়েছেন তাঁদের একজন সে সময়কার কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ক্রীড়াসম্পাদক পরেশ নন্দী এবং আর-একজন সত্যানন্দ ভট্টাচার্য। সত্যানন্দবাবু পঞ্চাননবাবুর ছোটো ভাই। দাদার মতো তিনিও স্বাধীনতাসংগ্রামী। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে বেশ কয়েকবছর কাররুদ্ধ হয়েছিলেন। ভয়ানক কমিউনিস্ট বিরোধী। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি সি পি আই এম দলের নেতা ও নকশালপন্থী হিসাবে কলকাতার রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যানন্দবাবুর

সংবাদপত্র থেকে চলে যাওয়া আমার অভিজ্ঞতায় এক অপূরণীয় ক্ষতি। এত চমৎকার হেডিং করতেন এবং ইংরেজি শব্দের নতুন নতুন বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টির এক অসাধারণ মুনশিয়ানা ছিল তাঁর। সেই সময়কার সংবাদ জগতে মালয়েশিয়ার জঙ্গলে একটি যুবতি মেয়েকে পাওয়ার ঘটনা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও এক সময়ে ওই কিশোরী কীভাবে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে এসে পড়ল তা ছিল রহস্যাবৃত। কিন্তু ব্রিটিশ গোরখা বাহিনী মালয়েশিয়ার জঙ্গলে কমিউনিস্ট উৎখাত অভিযানের সময়ে মেয়েটিকে খুঁজে পায়। মেয়েটির বয়স তখন ১৮ থেকে ২০'র মধ্যে। এক ধরনের গাছের ছাল ছিল তার বস্ত্রসম্ভার। ইংরেজি কাগজগুলো তাকে 'জাঙ্গল গার্ল' বলে অভিহিত করল। কলকাতার দুটি বড়ো বাংলা সংবাদপত্র জাঙ্গল গার্ল-এর কোনও বাংলা প্রতিশব্দ বের না করে তাকে ওই 'জাঙ্গল গার্ল' বলেই উল্লেখ করছিল। কিন্তু সত্যানন্দদা একদিন আমাকে বললেন, ধুত্তোর, তুই 'বনবালা' লেখ। জাঙ্গল গার্ল লিখবি না। এই প্রতিশব্দটা খুব খাঁটি। কয়েকদিন পরে অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রগুলিও সত্যানন্দদার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। সত্যানন্দদার একটি গুণ ছিল, তখনকার দিনের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের গলার স্বর নকল করা। সত্যানন্দদার পারমানেন্ট নাইট ডিউটি ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ পেজ মেকআপ শেষ করে শিশির ভাদুড়ির কণ্ঠে আলমগিরের পার্ট করতেন— ভুল ভুল দিল্লির....। কখনও ছবি বিশ্বাস, কখনও অহীন্দ্র চৌধুরি, কখনও নির্মলেন্দু লাহিড়ি, এবং আশ্চর্যজনকভাবে রানিবালার কণ্ঠস্বরও নকল করতেন। আলমগির নাটকে একটি গান আছে যেটি রানিবালার কণ্ঠে গীত হত— 'নয়নের কোণে একটি বিন্দু ঝরে....'। সত্যানন্দদা গানটি নকল করে রানিবালার কণ্ঠে-ই গাইতেন। এরপর পরেশদার কথা বলি। পরেশদা ন্যাশনাল ইনশিয়োরেন্সে কাজ করতেন। ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিধুভূষণ সেনগুপ্তের শ্যালক। পরেশদা *দ্য নেশন* পত্রিকার (শরৎ বসু প্রতিষ্ঠিত) ক্রীড়াসম্পাদক ছিলেন। *নেশন* পত্রিকাটি উঠে যাওয়ার পর তিনি *লোকসেবক* পত্রিকায় যোগ দেন। খেলার রিপোর্ট ইংরেজি এবং বাংলায় এমন সাবলীল লেখার ক্ষমতা সম্ভবত তখন আর কারুর ছিল না। তিনি লখনউয়ের *ন্যাশনাল হেরাল্ড* এবং হায়দরাবাদের 'ডেকান হেরাল্ড'র কলকাতা সংবাদদাতাও ছিলেন। ছিলেন প্রচণ্ড রসিক। খুব শৌখিন পোশাকে থাকতেন। মাথাভর্তি সাদা চুল। ঘরে ঢোকার আগেই চুরুটের গন্ধে আমরা বুঝতে পারতাম পরেশদা আসছেন। পরেশদার দুটি মেয়ে ছিল। তাদের বয়স তখন ১৬ থেকে ১৮'র মধ্যে। তিনি মেয়ে দুটিকে বার্তাবিভাগে এনে প্রায়শই আমাকে বলতেন, দ্যাখ, কোনটাকে তোর পছন্দ হয়। মেয়েরা বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে অফিস থেকে চলে যেত। পরেশদা এন্টালিতে *লোকসেবক* অফিসের কাছাকাছি থাকতেন। আমার সম্পর্কে ওঁর একটা ধারণা হয়েছিল, আমি যদি খবরের কাগজ থেকে না চলে যাই তা হলে আমার খুব নাম-ডাক হবে। ১৯৫৪ সালে ইনশিয়োরেন্সে জাতীয়করণ হওয়ার পর পরেশদা এল আই সি'র একটি উচ্চপদ নিয়ে বোম্বাই চলে যান। ফলে